পাপ

সৌরভ চক্রবর্তী

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূ মি কা

এক শীতের সন্ধেতে বসে হঠাতই এই বইটা তৈরি করার কথা মাথায় এসেছিল। সেদিন ঘাঁটছিলাম বিভিন্ন রকম গল্প-সংকলন। ভূতের গল্প-সংকলন, মার্ডার মিস্ট্রি, বিভিন্ন রকমের রহস্য গল্প-সংকলন এমনকি প্রেমের গল্প সংকলন— আমাদের বাংলায় কোনোপ্রকার গল্প-সংকলনের অভাব নেই। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই কুয়াশাঘন সন্ধেতে আমার সংগ্রহে কোনো পাপের গল্প সংকলন খুঁজে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে ফোন লাগাই, সেখানে আমার অনেক সুহৃদ আছেন। ওদের সঙ্গে আলোচনা করি। কিন্তু না, পাপের গল্প নিয়ে কোনো সংকলন আমাদের বাংলায় এর আগে প্রকাশিত হয়নি। তাই আমিও খুঁজে পাইনি।

আমাদের মতো ধর্মভীরু দেশে যেখানে কথায় কথায় পাপ-পুণ্যের দোহাই দেওয়া হয়, পাল্লা-বাটখারায় মাপা হয় সমস্ত কাজকে, এমনকি চিত্রগুপ্তের মতো খাস লোক নিযুক্ত করা রয়েছে পাপের হিসেব রাখার জন্য, সেই দেশেই কিনা পাপের গল্পের সংকলন নেই! এদিকে বিদেশে পাপ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে 'সিন' বলে তা নিয়ে প্রচুর লেখালিখি। ওদের চিত্রগুপ্ত নেই, কিন্তু গল্প-সংকলন আছে। এই অন্যায় আমার পক্ষে মানা সম্ভব হল না। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম যে আমাদের দেশেও সেরকম একটা সংকলন থাকবে। কেউ যখন লেখেনি, আমি নিজেই লিখব সেটা। তারপরেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম এই গুরুদায়িত্ব।

যাক, মজার ছলে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়কে কিছুটা সরল করতে পারলাম বোধহয়। এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি বরং। পাপ এবং পুণ্য আসলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি। আমার কাছে যা পাপকর্ম, সেটাই হয়তো কারও কাছে পুণ্য অথবা কোনো যুক্তিযুক্ত কর্ম। আবার উলটোটাও সত্যি। তবুও আমাদের আইনব্যবস্থার চোখে, এমনকি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতেও কিছু কিছু অপকর্মকে পাপকার্য বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা হত্যার কথা বলতে পারি। মানবহত্যা হোক বা পশুহত্যা, যে-কোনো সাধারণ পরিস্থিতিতে সেটা একটা পাপকার্য। কাউকে খুন করা, ধর্ষণ করা ইত্যাদি কাজগুলোর পিছনে খুনি কিংবা ধর্ষকের যা'ই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তা কখনও পুণ্য বলে ধরা যেতে পারে না।

বিভিন্ন রকমের পাপ সংঘটিত হয়েছে এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে। সেই পাপগুলো নিয়ে বিস্তারিত এই ভূমিকায় আলোচনা করব না। আশা করি গল্পের মাধ্যমেই সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছবে। তবে এই গ্রন্থে, বিদেশে যেটাকে 'সেভেন সিন' বা সাত রকমের পাপ বলে, সেই

বিষয়টিকে আলাদাভাবে আমি ইচ্ছে করেই তুলে ধরার চেষ্টা করিনি। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত আমাদের বাঙালি পাঠকের উপযুক্ত করে গল্পগুলো পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি।

সহজ-সরল কিছু চরিত্রের পাশাপাশি ঝাঁ-চকচকে কিছু চরিত্রও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। *পাপ* ও *পয়োস্বিনী*-র মতো অকল্পনীয় একটা বিষয়কে নিয়ে লিখেছি। যে বিষয় হয়তো বাস্তবে কোনোদিন ঘটবে না। কিন্তু লেখক হিসেবে আমাদের গল্পের প্লটের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। পাঠকদের এরকম নিত্যনতুন প্লটের গল্প ভালো লাগে। এর পাশাপাশি *মামলার শেষে*-র মতো কোর্টরুম ড্রামা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। এটিও বাস্তবে প্রায় অসম্ভব এক প্লট। এরকম আটটি কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থ। যেখানে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমি অভিনব প্লটের সাহায্য নিয়েছি। কতটা সফল হয়েছি সেটা আপনাদের মতামত যখন শুনব তখন বুঝতে পারবো।

এই গ্রন্থের আটটি কাহিনি বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেগুলোকে একত্রিত করা হল এই গ্রন্থে। এই আট কাহিনিকে একটা সুতোয় বেঁধেছে— পাপ। আর এভাবেই গড়ে উঠেছে আক্ষরিক অর্থে পাপের গল্প-সংকলন।

ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ বাংলাদেশের পাঠকের হাতেও পৌঁছবে। বাংলাদেশের পাঠকদের আমার লেখক জীবনের শুরুর সময় থেকে পাশে পেয়েছি। ওদের জানাই একরাশ ভালোবাসা।

এই গ্রন্থের শেষ মুহূর্তের কাজ যখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছিল, তখন আমার পরিবার যেভাবে আমার পাশে থেকেছে তার জন্য আমি আমার পরিবারের সকলকে ভালোবাসা জানাই।

পরিশেষে বলি, পাপ কার্য থেকে বিরত থাকাটাই মানুষ হিসেবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই কাহিনিগুলো সেই ইঙ্গিতবাহী।

আর কী, পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে, এবার ঘড়ার জল পান করুন প্রিয় পাঠক!

পাঠ শুভ হোক।

ধন্যবাদান্তে,

সৌরভ চক্রবর্তী
কলকাতা
১৪ জানুয়ারি, ২০২৩
authorchakraborty.sourav@gmail.com

সূ চি প ত্র

১৫
পাপ ও পয়স্বিনী

৬৫
মামলার শেষে

৮৯
খেলনাওয়ালা

৯৭
শৌখিন রাত

১০৯
রোস্টেড চিকেন

১১৭
আস্তিক

১৩৫
লাস্যময়ী

১৪৭
সুইসাইড টাওয়ার

পাপ ও পয়স্বিনী

উত্তর কলকাতার এক প্রায় নির্জন নির্বান্ধব প্রান্তরে ইদানীং একটি ফ্যাক্টরি হয়েছে। শোনা যায় অনেক আগে এখানে শহরের বর্জ্য জমা হত। তারপর বর্জ্য জমা করার জায়গা পরিবর্তন হয়। অল্প দামে কোনো এক ব্যবসায়ী সে জায়গা কিনে নেয়। তারপর আরও অনেক হাতবদল। বর্তমানে জায়গার মালিকের নাম বোধহয় কোম্পানির সাধারণ চাকুরেরা অব্দি জানে না। আশেপাশের লোকজন শুধু জানে এই ফ্যাক্টরির গেট দিনের আলোতে দু'বার খোলে। এক ভোরে, দুই বিকেলবেলায়। বেশ কিছু বোঝাই করা ট্রাক বেরিয়ে পড়ে সেই গেট ধরে এবং শহর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

আর একটা কথা বলে রাখা ভালো। ইদানীং শহরে দুধের বিক্রি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। নাহ্, গোরুর বা মহিষের দুধের নয়, মানুষের দুধের। প্যাকেটজাত হয়ে বিকোচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক। হ্যাঁ, এক্সপায়ারি ডেটটাও নাকি লেখা থাকে তাতে।

১

সাতটা বেজে গেছে প্রায়, মর্নিং ওয়াক শেষ। ইয়ারপ্লাগ কানে গুঁজে পছন্দের গান চালিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরে তিয়াষ। পরনে কালো ট্র্যাকস্যুট আর কালো স্লিভলেস টপ। পকেটের মধ্যে ফোন ভাইব্রেট করতেই ব্লুটুথে রিসিভ করে তিয়াষ। মায়ের ফোন।

- হ্যাঁ মা, বলো।

জগিং করতে করতেই কথা বলতে থাকে সে।

- কোথায় আছিস?

- পৌঁছে গেছি প্রায়।

- আসার সময় তপনজ্যেঠুর দোকান থেকে এক প্যাকেট দুধ নিয়ে আসিস তো। ফ্রিজে নেই। তোর বাবা এখুনি উঠে দুধ চায়ের জন্য ঘর মাথায় তুলবে।

- আচ্ছা।

ফোন কেটে দেয় সে। মোড়ের মাথায় তপনজ্যেঠুর দোকান এই সময় খালিই থাকে। দোকানে গিয়ে এতদিনকার পছন্দের

ব্র্যান্ডের গোরুর দুধ নিয়ে নেয় তিয়াষ। এই দোকানে মাসের শেষে একসঙ্গে পেমেন্ট হয়। তাই দুধ নিয়েই ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ায় সে।

দোকান থেকে যে'ই না কিছুটা এগিয়েছে, মোড়ের মাথায় কিছু ছেলেকে দেখতে পায় সে। ওপর থেকে নিচ অব্দি এরা তিয়াষকেই মাপছিল। তিয়াষ স্বভাবসুলভ এদের পাত্তা না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসার সময় একজনকে বলতে শোনা যায়,

- গোরুর না মানুষের?

তিয়াষ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। কানে এখন গানটাও আর বাজছে না। তাই কথাটা শুনতে পায় সে। একবার থামে কিন্তু সকাল সকাল মেজাজটা চড়াতে চায় না সে। আবার হাঁটতে থাকে। আবার শোনা যায় একই গলায়,

- না কি নিজের? প্যা-কে-ট করা?

নাহ্, এবার আর কিছু করার থাকে না। ঘুরে তাকায় তিয়াষ এবং গটগট করে ছেলেগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুটা হকচকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছেলেগুলো। এতটা আশা করেনি তারা। যে বলেছিল কথাগুলো তার দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাতের প্যাকেট উঁচিয়ে তিয়াষ উত্তর দেয়,

- তোর মায়ের। বিশ্বাস না হলে খেয়ে দেখতে পারিস। স্বাদ মনে পড়ে যাবে।

এতটাই জোরে বলে যে রাস্তার লোকজন তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। কথাটা শেষ করে আর দাঁড়ায় না তিয়াষ। হনহন করে ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে থাকে।

পেছনে অন্য ছেলেগুলোর মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায়,

- আরও খচাতে যা তিয়াষ ব্যানার্জিকে। পাড়ার এক নম্বর পিস!

বাড়ি পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে চায়ের কাপ হাতে ড্রইংরুমে এসে বসে সে। বাবা পত্রিকা পড়ছেন। সে টিভি খুলে খবরের চ্যানেলটা ধরল। মা হাতে কী একটা কাজ করছিলেন। বললেন,

- এই হয়েছে, বাপ পত্রিকায় খবর খুঁজবে আর মেয়ে টিভিতে। কেন যে জার্নালিস্টকে বিয়ে করেছিলাম!

হালকা ফোড়ন কেটে কথাটি বলেই রান্নাঘরে চলে যান তিয়াষের মা।

তিয়াষ জবাব দেয়,

- মেয়েকেও মাস কম নিয়ে পড়াশোনা করানোর সিদ্ধান্ত কিন্তু তোমারই ছিল, বাবার নয়।

- ছাড় তো তোর মায়ের কথা। এইটা পড়।

তিয়াষের বাবা পত্রিকাটা এগিয়ে দিলেন। রাজ্যের প্রথমসারির এই পত্রিকার প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো করে লেখা আছে— *'মা' ব্র্যান্ডের দুধ এবার শহর ছাড়িয়ে মফস্সলের পথে, শীঘ্রই শেয়ার বাজারে আসছে স্টক।*

আর্টিকেলটা গোটা পড়ে পত্রিকা ফেরত দেয় তিয়াষ,

- আমাদের টিমও আজ বা কালের মধ্যেই এদের নিয়ে কিছু একটা নিউজ করবে শুনেছি। হয়তো আজই মিটিং হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস না কি একজন মালিক, সেটাই ধোঁয়াশা। কর্মচারীরাও শুনেছি সেভাবে কিছুই জানে না। কীভাবে কী হয়, কিছুই আমরা জানি না। ফ্যাক্টরির ঠিকানা আছে কি নেই জানি না, কিন্তু থাকলেও শুনেছি তাতে প্রবেশাধিকার নেই। প্রচুর বিক্রি এদের, প্রফিট মার্জিনে অন্যান্য কোম্পানি এদের আশেপাশেও থাকবে না। শহর কলকাতা যে কীভাবে এরকম নতুন একটা কনসেপ্টকে এত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নিল সেই নিয়েই মিডিয়ায় হট্টগোল শুরু হয়েছে।

- এসব না ভেবে মুদ্রার অন্যদিকটা ভেবেছিস কখনও?

- কোন দিক?

- এত এত প্যাকেট ব্রেস্ট মিল্ক কীভাবে আসছে, কাদের থেকে আসছে? তারা কি সেখানে এমপ্লয়ি, না কি...

বাবার কথা শুনে কোঁচকানো ভ্রু সোজা হয় তিয়াষের, মেরুদণ্ড হয় টানটান।

- তোর বয়সে একটা ছোটো লিড পেলেও মনটা চনমনে হয়ে উঠত, আর এইটা একটা আস্ত লিডের গোদামঘর। শেকড় অব্দি যাওয়ার চেষ্টা করিস। কেরিয়ার সেট হয়ে যাবে।

বাবা উঠে স্নান করতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিয়াষের পিঠে দু'বার ট্যাপ করলেন। তিয়াষ জানে এ ট্যাপ ভরসার। মানুষটা এমনিই এমনিই পঁয়ত্রিশ বছর জার্নালিজম করেননি, নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এই নিউজে। নইলে এভাবে বলতেন না। উঠেপড়ে লাগতে হবে এবার।

মামলার শেষে

মুহুরি টাইপ শেষে প্রায় একদিস্তা কাগজ সামনে এগিয়ে দিল। দু'জন লোক এগিয়ে এসে কাগজের দিস্তাটা মুহুরির হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মুহুরির বিল মিটিয়ে সামনের চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল তারা।

- দুটো চা দাও। হ্যাঁ তো তুমি কী বলছিলে?

- দাদা, এরকম জিনিস আমাদের ভারতীয় আদালত আগে কখনও দেখেনি। তাই বলছিলাম কী...

- না, না। আর কিছু বলার দরকার নেই। যা কিছু কথাবার্তা, সব ওখানেই হবে। রিস্ক নিলাম উর্দু রিস্প-এর জন্য। না হলে এবার না খেয়ে পথে বসার সময় এসেছে আমার।

- রিস্প মানে তো খাবার, বাব্বা উর্দু! আচ্ছা। আর লাইসেন্স যাবার ভয় নেই?

সামনের লোকটা এবার মুচকি হেসে গ্লাসের চা একটানে শেষ করল। বিল মেটাল অন্যজন।

***

সকাল হতেই আদালত চত্বরে ব্যস্ততা। শহরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ক্রাইম হচ্ছে মিসেস রাস্তোগি হত্যার মামলা। ঘটনা ঘটেছে অনেকদিন। কিন্তু এখনও খবরটা প্রথম পাতাতেই রয়ে গেছে। কারণটা ভাইরাল হয়ে যাওয়া এক ভিডিয়ো। যেখানে মি. রাস্তোগি তাঁদের বিবাহবার্ষিকীর দিন ফেসবুক লাইভে এসে জানান তাঁর গিন্নির জন্য তিনি একটি সোনার নেকলেস উপহার এনেছেন এবং সেই উপহার নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। লিফট দিয়ে উঠে তিনি নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখলেন দরজা আগে থেকেই খোলা। কিছুটা হতভম্ব হলেন মি. রাস্তোগি এবং লাইভে এসব দেখে চলা বাকি দর্শক। আস্তে আস্তে তিনি ভেতরে ঢুকলেন এবং পরিপাটিভাবে সাজানো একটি ঘর আবিষ্কার করলেন। ঘরের সাজসজ্জা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মিসেস রাস্তোগি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী উপভোগ করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? দু-একবার মি. রাস্তোগি গিন্নির নাম ধরেও ডাকলেন। কিন্তু যা হয়, এরকম সময়ে উত্তর খুব কমই পাওয়া যায়। থ্রি বি এইচ

কে-র মাস্টার বেডরুমে পাওয়া গেল মিসেস রাস্তোগির নিথর দেহ। ঘটনার সাক্ষী থাকল প্রায় পুরো সোশ্যাল মিডিয়া। বডি পাওয়ার পর যতটা কান্নায় মি. রাস্তোগি ভেঙে পড়লেন, তাঁর দ্বিগুণ বেগে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল বাজারে।

অচিরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করল এবং বেসিক কিছু তথ্যের ও অভিযোগের ভিত্তিতে মি. রাস্তোগিকেই গ্রেপ্তার করল। কিন্তু আদালতে দিন যত গড়াল তত মি. রাস্তোগি ও অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় সবার বক্তব্যে মিসেস রাস্তোগির এক গুপ্ত প্রেমিকের কথা সামনে এল। মিসেস রাস্তোগির এই অ্যাফেয়ারের কথা সবাই জানতে তো পেরেছিল, কিন্তু সেই প্রেমিকের সন্ধান পুলিশ লাগাতে পারল না। চেহারার যা বৃত্তান্ত পুলিশের কাছে এল তাতে গোটা শহর চিরুনি-তল্লাশি করেও সেই ব্যক্তির সন্ধান কেউ দিতে পারল না এবং যা প্রমাণাদি পরবর্তী সময়ে হাতে এল তাতে এটা পরিষ্কার হল যে সেদিন মি. রাস্তোগি ফ্ল্যাটে আসার আগেই মিসেস রাস্তোগি খুন হয়েছেন। রাস্তোগিসাহেব জামিন তো পেলেন কিন্তু আদালতে শুধু তারিখ বাড়তে লাগল। আসল অপরাধীর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

যখন আদালতে শুনানি হত, তখন জনতার ভিড়ে এক তরুণ উকিলকে বসে থাকতে দেখা যেত। নাম ইলিয়াস মোহম্মদ। সব বড়ো মামলার ঠেকেই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। অথচ নিজের রোজগার প্রায় নেই বললেই চলে। ছোটোখাটো কাগজ বানানো আর খদ্দের জোগাড় করে বড়ো উকিলের সাথে মিটিং করিয়ে দেওয়া অব্দিই তাঁর দৌড়। বন্ধুরা মজা করে বলত, ইলিয়াস ওকালতি পাশ করেই ক্রাইমটা করে ফেলেছে। এখন শুধু যাবজ্জীবন কাটাচ্ছে।

এরকম আরও আরও অপমান। অবশ্য ইদানীং ইলিয়াসের গায়ে সয়ে গেছিল সব। সে শুধু অপেক্ষা করত এরকম কোনো কেসের যা আর পাঁচটা কেস থেকে আলাদা হবে। আদালতে বিচার হবে অন্য পদ্ধতিতে। ক্রাইম হবে সবচেয়ে ইউনিক। লোকে ইলিয়াসের মুখে এসব শুনত আর খুব হাসত। ঠিক যেমন সেদিন বন্ধু-উকিলরা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল যখন ইলিয়াস বলল,

- নাহ্। এ কেস আলাদা। যদি আমার বেসিক ইনস্টিংক্ট সঠিক হয় তবে...

এক বন্ধু বলে উঠেছিল,

খেলনাওয়ালা

"শুনেছি এই শহরের সমস্ত ভুডু পুতুল আপনার দোকান থেকেই সরবরাহ হয়, এটা সত্যি?"

শনিবার, বিকেল হয়ে এসেছে। কলেজ স্ট্রিটের থেকে বেরিয়ে রাজা রামমোহন রায় স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে থাকলে কিছু বিহারি পানের দোকান পড়ে। তাদের পেছনের গলিতে একটা খেলনার দোকান— চামারিয়া টয় হাউস। বহু পুরোনো দোকান। আজকালকার ঝাঁ-চকচকে প্লে-স্টোরের মতো এ দোকান নয়। তবু চামারিয়াজি এই দোকান সারাই করান না। ভেঙে পড়া ঐতিহ্য নিয়ে রোজ দোকানের শাটার খোলেন এবং বিকেলে বন্ধ করেন। দোকান পুরোনো হলে কী হবে, বংশপরম্পরায় কাস্টমার-ভাগ্য বেশ সরেস। যা আয় হয় বেশ চলে যায় তাঁর। মধ্যবয়স্ক চামারিয়াজি কারও সাতেপাঁচে থাকেন না, নিজের সাতেপাঁচেও কাউকে আসতে দেন না। এহেন চামারিয়াজিকে এই শনিবারের প্রাক-সন্ধেতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে এই প্রশ্ন করলেন। চামারিয়াজি তাঁকে একবার ভালোভাবে মেপে নিয়ে তাকের ধুলো পরিষ্কার করায় মন দিলেন।

- কী হল? চুপ করে গেলেন যে?

বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলেন।

- আপনি ভুডু করবেন কাউকে?

চামারিয়াজি না তাকিয়ে উত্তর দিলেন।

- খেপেছেন নাকি! শুনলাম আপনিই নাকি ওসব পুতুল-টুতুল সাপ্লাই করেন, তাই...

- ভুল শুনেছেন। আমি ভুডুর পুতুল সাপ্লাই করি না। সাধারণ পুতুল বিক্রি করি। কেউ তাকে বাড়িতে গিয়ে ভুডুর পুতুল বানিয়ে ফেললে আমার তাতে কিছু করার নেই।

এবারও নিজেকে শান্ত রেখেই উত্তর দিলেন চামারিয়াজি।

- পিন?

বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন শুনেই কটমট করে তাকান চামারিয়া।

- বললাম তো...

- আহা, চটছেন কেন? সেফটিপিন আছে? আমার ছাতাটার সেলাই খুলে গেছে।

বলে বৃদ্ধ নিজের ছাতাটা দেখান।

চামারিয়াজি একটা সেফটিপিন এগিয়ে দিলেন।

- আপকো চাহিয়ে ক্যা?

অভ্যাসদোষে বাঙালি কাস্টমারকেও হিন্দিতে প্রশ্ন করে বসলেন চামারিয়া।

বৃদ্ধ খাটো চোখে এগিয়ে এলেন কাছে, বললেন

- ইস্পেশাল কোনো খেলনা আছে নাকি? হেঁ হেঁ...

চামারিয়াজি এবার উত্তরদিকের খেলনার তাকে এগিয়ে গেলেন এবং একটা ময়লা বাক্স নিয়ে ফিরলেন।

- এটা স্পেশাল।

বৃদ্ধ খপ করে বাক্সটা কেড়ে নিলেন। যেন এটার খোঁজেই ছিলেন। ময়লা চারকোনা এক বাক্স। পাশে রাখা একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিতেই স্পষ্ট হল লেখা— পাজল, সিন্স ১৯২১।

- ১৯২১ সাল থেকে পাজল। এটাকে কেউ সমাধান করতে পারেনি নাকি! কী হে?

সন্ধে হয়ে আসা ঘুপচি গলির পুরোনো খেলনার দোকানের মালিককে এবার একটু অন্যরকম লাগে, যেন এ প্রশ্ন তাঁকে নয়, অন্য কাউকে করা হয়েছে। উত্তরও যেন অন্য কেউই দিল।

- নিয়ে যান এটা। এটা একটা স্পেশাল খেলনা। এর ধাঁধার উত্তর এখনও কেউ খুঁজে পায়নি। তাই এটা ফিরে ফিরে আসে এই দোকানে।

বৃদ্ধ ঘাবড়ালেন না। চুপচাপ দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে একটা পুরোনো অ্যাম্বাসেডরে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ। বাক্সটিকে পাশের সিটে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

ট্রাফিকে আটকে থাকা শহর পেরোতে দেড় ঘণ্টা বেরিয়ে গেল। যখন বিরাটির রাস্তায় পৌঁছলেন, তখন সন্ধে প্রায় আটটা। এদিকটায় শহর কলকাতার ভিড় নেই। তুলনামূলক ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি এসে থামল একটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করে লিফটে চড়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলেন বৃদ্ধ। চারতলায় শেষ কোনায় তাঁর ফ্ল্যাট।

বাক্সটাকে কাঁচের টেবিলে রেখে বৃদ্ধ ওয়াশরুমে চলে গেলেন। নিজের চেহারাটাকে একবার আয়নায় দেখে নিলেন। বয়সের ভারে বলিরেখা স্পষ্ট, কিন্তু আজ রাতে নার্ভ ধরে রাখতে হবে তিনি জানেন।